সুলতানা আজীম

তবুও প্রেম

গল্প

এক। কখনো ওর মুখে, কখনো ওর মুখে শুনে, আমি লিখলাম বর্ণালীর জীবনের কিছু অংশ। দুই। সচেতন ভাবেই লিখলাম, অনেক ইংরেজি শব্দ। না হলে, বোঝাতে পারছি না সঠিক ভাবে, মনে হয়েছিলো।

ওর নামও সুলতানা। নামটি, ভালোলাগে না আমার। বর্ণালী ডাকি ওকে। এটি খুব পছন্দ ওর। আমারও। কী ধরনের সে, তা যদি লিখতে চাই, বোঝাতে পারবো না ঠিক। লিখছি তবুও। লিখছি, একটু খানি। জন্মের পর থেকে এমনই ছিলো সে। এটি প্রমাণ করে তার সুস্থতা। খুব সুস্থ তাকে বলা যায় না অবশ্যই। বেশি আদরে গড়ে তুললে যা হয়। গড়ে তুলেছেন যারা, তারা নিশ্চয়ই বুঝতেন না, তার জীবনের জন্যে কতোটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে, এভাবে বড়ো করে তোলা।

অনেক ধরনের স্পোর্টস করে সে বডি ফিটনেস ঠিক রাখতে। এসব শুরু করেছে, কিশোরী বয়সে প্রবেশ করে। যখন বুঝতে এবং জানতে পেরেছে, শরীরের প্রতিটি অরগান এবং মাসল যথেষ্ট সবল না হলে, ফিটনেস আসবে না। তবুও শরীরটিই তার প্রধান এবং একমাত্র শত্রু। বিরোধিতা করেছে সবসময়। কতো কতো ধরনের এলার্জি তার। কিসে নেই এলার্জি? এলার্জিটিক শরীর কী শান্তিতে থাকতে দেয় কাউকে? বৃষ্টির জল গায়ে পড়লো, বাইরে গেলো শীত সন্ধ্যায়, জ্যাকেট ছাড়া□কাশী আর কাশীর অবস্থানে থাকবে না। ক্রনিক হয়ে, তা পরিণত হবে ব্রঙ্কাইটিজে। কতোদিন যে ভুগবে মেয়েটি। আর কী যে কষ্ট পাবে। ধুলো লাগলো গায়ে, তো, তখনই আক্রান্ত হবে। হাঁচি হাঁচি আর হাঁচি। র‍্যাশ হবে পুরো শরীরে। তা পৌঁছে যাবে নিওরোডিমিট্রিজে। আবদ্ধ ঘর সহ্য করতে পারে না। এয়ার কন্ডিশন নয়, ফ্যানের বাতাসও নয়, থাকতে হবে তাকে প্রাকৃতিক বাতাসে। খুলে রাখতে হবে জানলা। যে কোন সিজনে। দিনে। রাতেও। প্রতি মুর্হূতে এরকম শরীরি সমস্যা নিয়েও, যে ভাবে বেঁচে আছে সে, একটি শব্দে বললে, চমৎকার।

ভালোবাসি আমি ওকে। খুব ভালোবাসি। পরিচিত হলে ওর সঙ্গে, আমি নিশ্চিত, ভালোবাসবেন ওকে আপনি। পছন্দও করবেন। কেনো জানেন? ওর সব নেগেটিভ পজেটিভ দিকগুলো মেনে নিয়ে, পছন্দ করা যায় ওকে। ভালোবাসা যায়। যে কোন বিষয়ে আলোচনা করে ওর সাথে, মনে রাখার মতো সময় কাটাতে পারবেন আপনি। আবার চাইবেন। বার বার চাইবেন ওর সাথে দেখা হোক। আলোচনা হোক। সিরিয়াস সে নয় কোন ব্যাপারেই। কিছু হতেও চায়নি কখনো। যদি জানতে চান, এর কারণ কী? সে বলবে,

‘কিছু একটা হতে চেয়ে, বঞ্চিত হতে চাইনি, অনেক কিছু থেকে। নির্দিষ্ট সাবজেক্টে সমর্পিত জীবন, সীমাবদ্ধ হতে পারে।’

ওর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা, নাও মিলতে পারে আপনার সাথে, অনেক ব্যাপারে। প্রথম আলাপের পরেই মনে হতে পারে, সে অন্যরকম। যে কোন ঘটনা এবং যে কোন বিষয়ে, তার উপলব্ধি অন্য অনেকের মতো নয়। কাউকে দিয়ে প্রভাবিত হতে দেখিনি কখনো।

‘অন্য কাউকে দিয়ে প্রভাবিত হয়ে যদি বলি, চলি, লিখি এবং করি, তাহলে আমি কোথায়? কোথায় আমার নিজের মগজ, অনুভব এবং উপলব্ধি? প্রভাবিত হওয়া মানেই অন্যের চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শনে তুমি কনভিন্সড। মৌলিকতার অনুপস্থিতি। মৌলিকতা ছাড়া কী ক্রিয়েটিভ হতে পারে কেউ?’ মনে করে বর্ণালী। আরো কিছু হয়তো বলতে হবে ওর সম্পর্কে। প্রাসঙ্গিক মনে হলে, পরে।

যুবকটি, দশজনের মধ্যে একজন নয়, অন্য জন। এমন মনে হয়েছিলো তার। কোন প্রস্তুতি ছিল না। ছিল না অপেক্ষাও। দেখা হলো। প্রথম দিনটিতে, নাহ্ মনে রাখার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি।

দ্বিতীয় দিনটি, এলোমেলো ছিলো খুব। সন্ধ্যাটি ছিলো সোনালী রংয়ের। শরীর ছুঁয়ে যাওয়া শান্ত বাতাসে, ছিলো বিষণ্নতা। অনেকগুলো অফিসিয়াল কাজের ব্যস্ততায়, কেটেছিলো দিনটি। সাহায্য করবে সিস্টেম, কাজগুলো হয়ে যাবে নিয়মের মধ্যে। এরকম একটা ধারণা কাজ করেছিলো অবচেতনে, অভ্যস্ততায়। ডিজিটাল দেশ হবে। শুনছে দশ বছর ধরে। হবে হবে হবে। হবে’র পর্যায়েই প্রায় সব কিছু এখনো। এতো জটিলতা প্রতিটি কাজে। এতো সময় হত্যা করা। মন্ত্রণালয়গুলোতে এতো ভিড় কেন বাইরের মানুষের? কটা কাজ হয় ঘুষ ছাড়া? কতো ঘণ্টা কাটে রাস্তার যানজটে প্রতিদিন? নির্দিষ্ট কটি রাস্তা ছাড়া বাকি রাস্তাগুলোর অবস্থা? উন্নয়ন মানে কী?

সন্ধ্যা কী সোনালি হয়? যেখানে সে গিয়েছিলো, আলোময় ছিলো জায়গাটা। এতো আলো। বদলে দিলো ছাই রং সন্ধ্যা কে। সোনালি হলো। খুব এলোমেলো একটা দিনের ক্লান্তি, এখানে এনে পৌঁছালো তাকে। পরিকল্পনা ছিলো না। দেখা হলো তার সাথে আবার। দ্বিতীয় বার। খাবার এলো, দুজনের। অবাক হয়েছিলো বর্ণালী। কখন অর্ডার করলো সে? জানতেও চাইলো না, খেতে চাচ্ছে কী না অন্যজন। মিটার দূরত্বে বসেছে দুজন।

‘আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি, ভালোও লাগে অনেক।’ নিঃসঙ্কোচ কণ্ঠ যুবকের।

বিস্ময় নয়। কিছুই নয়। অভ্যস্ত এসবে বর্ণালী। আলাপ হয়েছিলো সেদিন দুজনার, বিভিন্ন বিষয়ে। কোন জবাব দেয়নি ওই বাক্য দুটোর। ধন্যবাদ, বলেছিলো অভ্যাসের কারণে। ভদ্রতা করে। ওই পর্যন্তই।

‘কফি তৈরি করি? ক্লান্ত লাগছে। এতো কাজ করেছি সারা দিন।’ বললো বর্ণালী।

‘আমিই তো করতে চাচ্ছিলাম। তোর কথা শুনছিলাম তো, দেরি হল তাই।’ বললাম আমি।

তৈরি করা ছিলো ফিশ ফ্রিকাডেলি। ব্রাউনি বানিয়েছিলাম সকালে। রং লালচে হলে, তুলে নিলাম ফ্রাইপ্যান থেকে ফ্রিকাডেলিগুলো। বসলাম বাগানে এবার।

আমার বাগানটির কথা বলি এখন। ছোট্ট পুকুরটির নীল নীল জলের চার পাশে, অন্যরকম চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে এটি। যিনি গার্ডনার তার কৃতিত্ব যতোটা, তার চেয়ে একটু কম কৃতিত্ব আমার। গার্ডনার হয়েছেন তিনি চার বছর কলেজে পড়ে। সার্টিফিকেট পেয়েছেন ভালো রেজাল্ট করে। মালি হয়েছি আমি, হতে খুব ভালোবাসি তাই। আমার বাগান সাজানোর ধারণাগুলো ভালো লেগেছিলো শিক্ষিত মালির। দুজনের ভালো লাগার ঐক্যে সাজলো বাগানটি। এ বাড়ির অতিথিরা বলেন, খুব সুন্দর, অন্যরকম বাগান। আমি বলি, মনে মনে বলি, রুপসি বাগান। অন্যরকম রুপসি।

মেতে আছে তুষারশুভ্র খরগোশগুলো ছুটোছুটি খেলার উল্লাসে এখনো। ডিনার তৃপ্ত কাঠবেড়ালিরা ফিরে যাবে ঘরে, কিছুক্ষণ পরে। কনর্সাট ক্লান্ত পাখিরা উড়ে উড়ে উড়ে, পৌঁছে যাবে নীড়ে। সাদা আর নীলের কী উত্তাল মিতালী, একটু উপরের আকাশে। নেমে আসবে সন্ধ্যা ঢেকে দিতে সব, অতি ধীর শালিকের মতো, কিছুক্ষণ পড়ে।

জমিয়ে রেখেছিলাম ওর জন্যে, প্রবীণ এই বিকেলটি। মনোযোগী হতে হবে আমাকে এখন। ‘বল বর্ণা।’ কখনো কখনো সংক্ষেপ করি ওর নাম।

‘আরো একটি দিন এলো, সেদিনের পড়ে। বৃষ্টির নূপুর বাজলো ক্লান্তিবিহীন, মাসটি শ্রাবণ নয়, তবুও। একটি কাজও হলো না সেদিন। ডিপ্রেসন হয় না আমার। হবার কারণ ও নেই। এক সময় ছিলো। প্রচণ্ড ছিলো। কেনো ছিলো? অন্যদিন বলবো, সে জীবনের কথা। হ্যাঁ, একটি তো নয়, অনেক অনেকগুলো জীবন থাকে মানুষের। সেই সব জীবন পেরিয়ে শেষ হয় একদিন, একটি জীবন।

আমাকে নিয়ে বাইরে যেতে চাইলো এক বন্ধু। বৃষ্টি ক্লান্ত দিন শেষের সন্ধ্যেটি ছিলো, বৃষ্টিবিহীন। স্পনটিনিয়াস সিদ্ধান্ত নেবো, সে চরিত্র আমার নয়। তবুও গেলাম। আমার কোন কোন বন্ধুর সন্ধ্যের শুরু এবং শেষ হয় ওখানে। ওখানেই, যেখানে ওই তরুণ অথবা যুবকের সাথে দেখা হয়েছিলো আমার। এই বন্ধুটি, যার নাম অনুপম, দুটো বই নিয়ে আলোচনা করতে চায়। যে দুটো পড়েছে সে ওই সপ্তাহে। যে কোন বই এবং সাহিত্যের সাথে আমার সর্ম্পক, নর্থ পোল আর সাউথ পোলের। ওর এবং আরো কজন বন্ধুর, সাহিত্য নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করার আগ্রহ, মরুভূমিতে এসে, সমুদ্রস্নান করতে চাওয়ার মতো।

বৃষ্টি ধোয়া গাছের পাতারা এতো সুস্থ, আর উজ্বল এতো। ছোট্ট বাগানটির ভেতর বসতে ইচ্ছে করলো আমার।

‘তোর যে রকম কোল্ড এলার্জি, ঠান্ডা লাগবে ওখানে বসলে’ বললো অনুপম।

ফিরে যাচ্ছি অন্য জায়গায় বসবো বলে।

‘আমাদের সাথে বসেন কিছুক্ষণ’। তরুণ অথবা যুবকের আহ্বান। হ্যাঁ সে। খাচ্ছিলো আর কথা বলছিলো দুজনের সাথে। হতে পারে তারা ওর বন্ধু। চারটি চেয়ার রয়েছে, একটি টেবিলে। খালি ছিলো যেটি, বসলাম সেটিতে। অভদ্রতা হয় তো, না বসলে। শুরু করতে যাচ্ছে, এমন একটি পরিকল্পনার কথা জানালো সে। হলো আরো কিছু কথা। বিরক্ত হতে পারে অনুপম, ফিরলাম ওর কাছে। কানডিড এবং অন্য কিছু গল্প, ভলতেয়ারের, অনুবাদ করতে চায়। আমার সহযোগিতা দরকার। উচ্ছ্বসিত আবেগে অধীর অনুপম। কোন পর্যায়ে আমার অসহায়ত্ব তখন, বল? বৃষ্টি স্নিগ্ধ সন্ধ্যেটি শেষ হলো সে দিনের, আমার অসহায়ত্বকে সমীহ না করে। ভালো যে, হলো তবুও।

আবারো দেখা হলো ওর সাথে। ওখানেই। অন্য একদিন। খাবার অর্ডার করার দায়িত্ব, নিজে থেকেই নিলো সে। অন্য তিন বারের মতো। সেদিনই প্রথম আলোচনা হলো, বেশি সময়, বিভিন্ন বিষয়ে।

‘আপনাকে এগিয়ে দেই সামনের দিকে, গাড়ি আসার অপেক্ষায় এতো রাতে একা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।’ বললো সে।

কথা হয় যেতে যেতে যে সব বিষয়ে, মতো পার্থক্য নয়, মতো বিরোধ হয় বেশি। রাগ হয়। ইচ্ছে করে ওয়ানট্যাক্ড মানসিকতা ভেঙে দিতে ওর। বলতে ইচ্ছে করে, সীমাবদ্ধতা সংকীর্ণ করে মানুষকে। আত্মকেন্দ্রিক করে। এতো রাগ হয়। এতো বেশি রাগ হয়। বলা হয় না কিছু। কোন কিছুই। অভদ্রতা হবে ভেবে। শেষ হলো সেদিন, যুবকের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। শেষ হলো না, ওর কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা। সে তর্ক করে। তর্ক করতে পছন্দ করে। নিজের ধারণা এবং মতকে চূড়ান্ত মনে করে অধিকাংশ সময়। বলেও সেভাবে। বেশি আত্মবিশ্বাসী। এবং এবং এবং। আধুনিক ভাবে নিজেকে। অহঙ্কারীও অনেক। ফিরে এলাম, অভিজ্ঞতার অস্বস্তি নিয়ে।’

হারিয়ে যাচ্ছে পরিশ্রান্ত সূর্যমণি কোন এক অজানায়। রহস্যময়ী সন্ধ্যামেয়েটি বিলিয়ে দেয় নিজেকে, চারপাশের বাগান আর বনানীতে, সবটুকু উদারতায়। দেখি, কীভাবে পালিয়ে যায় মৃদু পায়ে মধুর বিকেল। দেখি, ডানার পালকের নিচে সবকিছু ঢেকে, কী নির্ভয়ে নেমে আসে কোকিল রংয়ের রাত। দেখি, কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, প্রিয় প্রিয় বিকেলটি

আমাদের। দেখতে দেখতেই, বলে বর্ণালী।

“আমার পোস্টিং হয় অন্যদেশে। চলে যাই দূরে। অনেক দূরে। অচেনা পৃথিবী। অন্য জীবন। পেরিয়েছে চার মাস। যে কাজটি শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলো যুবক, শুরু করেছে। পাঠিয়েছে আমাকে তা মেইলে। জবাব লেখা, যতো দ্রুত সম্ভব, খুব জরুরি ভদ্রতা। ব্যস্ততা এতো, চাইলেও পারছি না লিখতে। অভদ্রতা হচ্ছে না? ফোন করি একদিন, হঠাৎ, কিছু না ভেবে। অবাক কী হলো সে? শুনছে আমার কথা। বলছে কম। শেষ হলো এক সময়, আমার কথা। শেষ হলো একসময়, তার শোনা। পেরিয়েছে এরপর আরো তিন মাস।

তুই তো জানিস, গ্রহণ এবং বর্জন এ দুটো ব্যাপারে সচেতন আমি। নিজের জীবনের জন্য যা জরুরি মনে হয় না, তা যতো আকর্ষণীয় হোক, গ্রহণ করি না। সবার মতো হইনি। হতে চেষ্টাও করিনি কখনো। ফেসবুকিং নির্দিষ্ট ছিলো, আমার প্রফেশনাল কাজের বৃত্তে। কলিগ ফোরামে। স্মার্ট ফোনে মেইলের জবাব লিখছিলাম একদিন। তা শেষ না করেই, একাউন্ট খুললাম দেশের ফেসবুকে হঠাৎ। না ভেবে যে কটি কাজ করেছি জীবনে, এটি তার একটি। পরিচিতদের অ্যাড করলাম বন্ধুর লিস্টে।

‘ভালো হলো আপনাকে ফেসবুকে পেয়ে।’ মেসেজটি এলো যুবকের কাছ থেকে।

চ্যাট করছি এই প্রথম। করছি তার সাথে, ভীষণ রকম ইগোয়িস্ট যে। করছি তার সাথে, খুব রাগ হয়, যার ওপরে আমার। তার সাথেই চ্যাট করছি, বুঝতে পারছি না যাকে।

দুটো দিক রয়েছে ইগোর। পজেটিভ হলে, ইগো থাকা জরুরি। নেগেটিভ হলে, ইগো ক্ষতিকর। সীমাবদ্ধতা, সঠিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং আরও কিছু কারণ রয়েছে এর পেছনে। সেটা বুঝতে পারছে না। মনে করছে সে যা জানে এবং বোঝে, সেটাই অ্যাবসলিউট। এও আধিপত্যবাদিতা। বেশি বোঝে, বেশি জানে, বেশি পড়েছে। অনেক বেশি। বেশি জানলে আর বেশি পড়লেই তো হয় না। কী পড়েছে, কোন মানসিকতায় পড়েছে, কী বুঝেছে, সেটাও জরুরি। বেশি জানলেই তো হয় না, কী জেনেছে, কোন চেতনায় জেনেছে, জরুরি সেটাও। লেখকের মানসিকতা, চেতনা, দর্শন, পড়তে এবং বুঝতে পেরেছে কী না, সেটাও কী জরুরি নয়? নির্দিষ্ট একটি বইকে, পাঁচ রকম মানসিকতার পাঁচজন পাঠক, পাঁচ রকম ভাবে পড়ে এবং পাঁচ রকম অর্থ করে।

আরো একটি কারণ রয়েছে, নারী। নারী তো বেশি বুঝতে, বেশি জানতে, বেশি পড়তে পারে না, পুরুষের চেয়ে। কোন কারণেই না। হ্যাঁ, নারী-ই আমি তার কাছে। সে কী জানে না, নারী-ই তো তাকে এনেছে পৃথিবীতে। দায়িত্বটি নারীর একার নয়। চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ওপর। সন্তানকে গড়ে তোলার। যত্ন করার। মেনে নিয়েছে নারী, যথেষ্ট কঠিন এই কাজটি। সেই মানুষদের আন্ডারস্টেমেইট করবে কেনো? করছে, সচেতন ভাবে নয়। স্বভাবের অভ্যস্ততায়। বুঝতে পারছি।

চ্যাট করতে থাকি তবুও, প্রায় প্রতিদিন। অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে অনুভূতিতে আমার। নতুন ধরনের অস্থিরতা। অন্যরকম অস্থিরতা। বাড়ছে এটা। বেড়েই যাচ্ছে প্রতি মিনিটে। প্রতি ঘণ্টায়। প্রতিদিন। এসব মানায় না আমার স্বভাবের সাথে। নিজের পছন্দে গড়ে তোলা জীবন। চলা? তাও নিজের মতো করেই। কে কী বললো, কে কী ভাবলো, কেয়ার করিনি কখনোই। অন্য অথবা অন্যদের ইচ্ছার জীবন, কেনো যাপন করবো আমি? জীবনটা যদি হয়ে থাকে আমার, কীভাবে তা যাপন করবো, সে সিদ্ধান্তও আমার। জানি এটা। মানিও এটাই।

কী হলো আমার? নেশা হচ্ছে। চ্যাট করার নেশা। কাজের ফাঁকে। বিশ্রামের মাঝে। দিনে রাতে। যখন তখন। কাজের ক্ষতি হচ্ছে খুব। সময় হারাচ্ছি অনেক। ঘুমোচ্ছি কম। কী খাচ্ছি, ভাবছি না তাও। তবুও। তবুও। নিজের ক্ষতি, ধারাবাহিক ক্ষতি, করে কোন মানুষ? করছি আমি। কিন্তু আমি-ই তো বলতাম, নেশা সে-ই করে, নিয়ন্ত্রণহীন যে। নিয়ন্ত্রণহীনতা মানে, ব্যক্তিত্বহীনতা। নেশা, তা যে কোন কিছুরই। ব্যক্তিত্বহীনতা, সেই নির্দিষ্ট নেশার জায়গায়। নেশা? হ্যাঁ, নেশা-ই তো। চ্যাট করার নেশা। নিয়ন্ত্রণ করছি না নিজেকে। করছি না, কেনো?

পেরিয়ে গেছে অনেকগুলো দিন। সপ্তাহ। মাস। চ্যাটের ভাষায় যা বুঝছি, কটি শব্দে বললে, যুবকটি এরকম, অহঙ্কারী, ত্যাদোড়, তার্কিক। অন্যমনষ্কতা এবং হেয়ালিও রয়েছে ওর আচরণে।

> মনের ক্লান্তি হারিয়ে যায় ঘুমের আদরে। জেগে যাই কোন অজানা কারণে আবার। রাত তখন কতো, জানতে ইচ্ছে করে না। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা হয়েছে যতোটুকু, তার জন্যে দায়ী টেলিভিশনের স্ক্রিন। কম ভয়ানক ছিলো না সেটা। কী হচ্ছে আমার? এ কেমন ভূমিকম্প? মাথা থেকে পা। পা থেকে মাথা। ভেঙ্গে যাচ্ছি। ভেঙ্গে যাচ্ছি। হয়ে যাচ্ছি ধ্বংসস্তূপ। বুঝতে পারি, ঢেউ তুলছে ‘অক্সিটোসিন।’ কাঁপাচ্ছে আমাকে। কাঁপাচ্ছে, ভীষণ ভাবে। কোন কর্তৃত্ব নেই আমার এর ওপর। ভূমিকম্প নয় শুধু। একই সাথে টর্নেডো। ঠেকাবো? সে শক্তি কোথায়? আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি আমি। তোমাকেই ভালোবাসি

নিজেকে বুঝি যতোটুকু, কটি শব্দে বললে, জেদি। খুব সহানুভূতিশীল। আত্মমর্যাদায় অবিচল। ত্যাদড় কখনো কখনো। মানসিকতায় রয়েছে সততা, স্বচ্ছতা। চ্যাট করছি নিয়মিত, এরকম দুজন মানুষ। হচ্ছে এর ভেতরেই, ঝগড়া, অভিমান, রাগ, মতো বিরোধ। চ্যাট করছি তবুও আমরা। আক্রান্ত দুজনেই, চ্যাটের ক্ষুধায়, বুঝতে পারি। কিন্তু কেনো? তা বুঝতে পারছি না।

অনুভব করি তার ভালোবাসা। অনুভব নয় শুধু, লেখেও সে। বার বার লেখে। এরকম একটি যুবককে কী ভালোবাসা যায়? ভালোবাসা কী ইচ্ছে, অনিচ্ছার অনুভূতি? ভালোবাসা নয়। প্রেম। প্রেম, তৃতীয় বার প্রবেশ করলো, আমার জীবনে। যার সাথে মতোপার্থক্য নয়, মতোবিরোধ এতো, কী করে ভালোবাসতে পারে তারা, একে অন্যকে? কী করে হতে পারে প্রেম? এক বিশেষ ধরনের নেশা হচ্ছে প্রেম। এই যে ক মাস ধরে চ্যাট করছি আমরা, কীসের নেশা এটা? ভালোবাসার? প্রেমের? কী জানি।

প্রেমের নেশার বয়স তো, অন্য যে কোন নেশার বয়সের চেয়ে কম। অনেক কম। অ্যামিন, ইথাইল আর ফিনাইলের জৈব রাসায়নিক নেশা এটা। খুব বেশি ভালো লেগে গেলে কাউকে, খুব আকর্ষণ অনুভব করলে তার জন্যে, মাথা থেকে এই রাসায়নিক জোয়ার, নার্ভের মাধ্যমে রক্তকে নির্ভর করে, প্লাবিত হয় সারা শরীরে। ব্যাকুল হয়ে পড়ে মানুষ, বিপরীত মানুষটির জন্যে। হয়ে পড়ে অধীর, অস্থির। দেখতে চায় তাকে। পেতে চায় কাছে। খুউব কাছে।

কেনো? আরো একটি জৈব রাসায়নিক, অক্সিটোসিন বলা হয় যাকে, এটি বিভিন্ন পরিমাণে মিশে থাকে মানুষের রক্তে। তৈরি করে, শরীর স্পর্শের

সুখ। পরের নির্ধারিত গন্তব্য হচ্ছে যৌনতা।

‘আপনি এদেশের মেয়েদের মতো নন। একেবারেই অন্য রকম। সেজন্যেই এতো ভালো লাগে আপনাকে আমার।’ যেদিন বললো সে, রাগ হলো আমার। প্রচণ্ড রাগ।

‘কোন পুরুষ কী দেখেছেন আমার মতো? তুলনা শুধু নারীদের সাথেই হবে কেনো? কেনো বলতে পারলেন না, আপনার মতো কোন মানুষ দেখিনি আমি এদেশে?’ বলেছিলাম আমি।

‘সত্যিই অন্যরকম একজন আপনি। সব ব্যাপারে ব্যতিক্রমী যুক্তি আছে আপনার।’ বলেছিলো সে।

‘নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধি ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করি না আমি। বর্জনও নয়। কথাটা বলেছি আগেও আপনাকে।’

সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা হয় না আমাদের। বেড়ে যায় আমারও, হেরে না যাবার টেনডেন্সি। অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে ওঠে, আমাদের সম্পর্কের ভেতর। চ্যাট যোগাযোগের কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে, অতিক্রম করি আমরা বৃত্ত।

কথা শুরু হয় ফোনে। এটিও হয়ে ওঠে, আর এক নেশা। ওকে নিতে পারছি না আমি। পারছি না ছেড়ে দিতে। ওর অনেক কথা, ক্ষুব্ধ করে আমাকে। আমার কণ্ঠ, কানে না পৌঁছালে, চলে না ওর। আমারও চলে না, ওর সাথে কথা না বললে। এক অভিনব সংকট। এক জটিল সম্পর্ক। দ্বন্দ্ব এখন কেবল ওর সাথেই নয়। নিজের সাথে নিজেরও। কী করবো আমি? ঘুম, এতো এতো এতো প্রিয় আমার। পালিয়ে যাচ্ছে কেনো? প্রেম, দু বার এসেছিলো জীবনে। এমন তো ছিল না। এক রকমও ছিল না। দুটো প্রেম সম্পর্ক, ছিল দু রকমের। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক তো ছিল না? অস্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যেও জন্ম নিতে পারে প্রেম? নেয় যদি, কারণ কী তার?

মতোবিরোধ হলে যে কোন বিষয়ে, আহত করতে আমাকে, এক সেকেন্ড ভাবে না সে। এভাবে তো কেউ কথা বলেনি আমার সাথে কখনো, আগে?

‘এভাবে কেউ বলেনি বলেই তো, অতি আত্মবিশ্বাসী তুমি। লিডার হয়ে থাকতে চাও সবসময়।’ বললো সে একদিন।

এর মাঝে কোন একসময় ‘তুমি’ বলতে শুরু করেছে। ভালো লেগেছে আমার, এই ‘তুমি’।

কী আশ্চর্য, এভাবে বলে কেউ? যার জন্যে এতো অস্থির থাকো তুমি। যাকে ভালোবাসো, এভাবে কেন বলবে তাকে? সেই মানসিকতাই কাজ করছে? সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা। লিডারের অবস্থান থাকবে তোমার। তুমিই প্রভূ। মানসিক অভ্যস্থতার বৈষম্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিশোধের সম্পর্ক আমাদের?

যদি হয় এমন সম্পর্ক, তা হতে পারে বিয়ের পরে। দুজনের জীবন মিলে, একটি সংসার হলে, অনেক কিছুই প্রবেশ করতে পারে এবং করে, সেই সংসারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিশোধ। ঘৃণা এবং আরও অনেক নেগেটিভ ব্যাপার।

প্রেম সম্পর্ক তো অনন্ত অসীম সম্পর্ক নয়। সীমা নির্দিষ্ট সম্পর্ক। গড়ে প্রায় চার বছর। এরই মাঝে একঘেঁয়ে আর ক্লান্ত হতে থাকে প্রেম। দুজনের জীবন আর প্রবল প্রেমের জোয়ারে ভেসে থাকে না। কমতে থাকে আকর্ষণ। পুরুষতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র এবং বিয়ের, শক্তিশালী কোন ভূমিকা থাকে না তখন। সুদীর্ঘ সময় একসাথে জীবন যাপন করা মানে, প্রেমের মাধুর্যে ভেজা জীবন নয়। অনেক জটিল দায় দায়িত্বের শেকলে আবদ্ধ হয়ে, একসাথে থাকার বিরক্তিকর অভ্যাস কেবল। অনেক দেশে, নারী পুরুষের, দুজনের ওপর দুজনের নির্ভরশীলতাও একই সংসারের বৃত্তে আবদ্ধ থাকার প্রধান একটি কারণ।

এও সেই জৈব রাসায়নিকের বিপরীত খেলা। তিন থেকে চার বছরের মধ্যে, এই রসায়ন, অ্যামিন, ইথাইল আর ফিনাইল, শরীরের ভেতরে এক ধরনের টলারেন্স তৈরি করে। দিনে দিনে বাড়তে থাকে। বাড়তেই থাকে। এর সাথে লড়াই করার মতো প্রেমের নেশা শরীর আর তৈরি করতে পারে না। প্রেম অনুভূতি হারাতে থাকে তীব্রতা। টলারেন্স যতো বাড়ে, ততো কমে আসে প্রেম। কমতে কমতে শিথিল হয়ে যায় প্রেম সম্পর্ক। প্রেম অভিলাসী মানুষেরা, বিচলিত বেদনাহত হয়ে পড়েন। জীবন্ত করে তুলতে পারেন না, এই নিষ্ক্রিয়তা আর শিথিলতা।

দুটো সম্পর্ক হারিয়ে যাওয়ার পরে, প্রেম সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ ছিলো আমার। কাজ করেছিলাম কিছুদিন এর ওপর। গবেষণার কাজ।

দুজন এক হয়ে সংসার করছি না আমরা। দশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থাকি। তবু কেন এতো জটিলতায় জটিল সম্পর্ক আমাদের? কী করবো আমি? কেনো সম্পর্ক রাখবো ওর সাথে? একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবার। হবেই।

কথা হলো না একদিন। হলো না চ্যাটও। একশ বছর কী কেটে গেলো না আমার?

‘এই তুমি ফোন ধরনা কেন, কী হয়েছে তোমার? কী করেছি আমি? কেন শাস্তি দিচ্ছো? খুন করতে চাচ্ছো আমাকে? কথা বলো। চুপ করে থাকবে না। কথা বলো।’ তার কণ্ঠে প্রচণ্ড ঝড়।

কী বলবো আমি? বলতে গেলেই ওর ক্ষুব্ধ আচরণের অভিযোগ করতে হবে। জবাব চাইতে হবে। কী জবাব দেবে ও? নিজের পক্ষেই বলবে। যেমন বলে, প্রতিবার। অপরাধ যা তা আমারই। ওর কোন ভুল নেই। অন্যায় আচরণও নেই।

সাটডাউন করতে হবে এবার আমাকে। এরকম যুদ্ধও করতে হয় মানুষকে? এতো অচেনা যুদ্ধ? নিজের বিরুদ্ধে, নিজের যুদ্ধ। পারছি না আর। অসুখী মানুষ তো আমি না। জীবনটি তো বেছে নিয়েছি নিজেই। গড়েছি, সাজিয়েছি জীবনকে, সম্পূর্ণ নিজের পছন্দে। আমার জীবনের রিমোট কন্ট্রেল, সে তো আমারই হাতে। কোন কারণে কতোটুকু যাতনা, আর কতোটা আনন্দ আমি নেবো, না কী নেবো না, সে সিদ্ধান্ত আমার। এভাবেই চলছিলো জীবন এতো দিন। নিজের সিদ্ধান্তে, নিজের নিয়মে। কী হলো এখন? পালিয়ে যাবো জীবন থেকে? সে মানুষও আমি না। তাহলে?

অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয় অফিস থেকে, মরোক্কো তে কাজ করার। ভালো হলো খুব। যদি স্থির করতে পারি নিজেকে এবার। আকাশের হাইওয়ে, ওড়ানোর পার্টনার আমার। অভ্যস্ত, মেঘের ওপরে চলা পথে। ঘুমিয়ে অতিক্রম করি, প্রায় পুরো সময়, প্রতিবার। কী হলো এবার? ঘুম কী আসে নি সাথে? গেলো কোথায়? একজনই এসেছে সাথে। সে। সেই তরুণ। না কী যুবক? কোথায় হারাবো আমি? পালাবো কোথায়?

আচ্ছা ও এমন কেন? ও কী স্যাডিস্ট? ও কী প্রিয়জনকে আহত করে আনন্দ পায়? রাগিয়ে দিয়ে অন্যকে, সুখী হয় খুব? ভালোবাসে আমাকে। অনুভব করি। কিন্তু ওর ভালোবাসার চরিত্র কেমন, বুঝতে পারি না। মুড ঠিক থাকলে, ভালোবাসে। ভালোবাসার শব্দ বাক্যগুলো বলে। বার বার বলে। লেখেও। মুড বদলে গেলে, বোঝা যায় না, ওর আচরণের চেহারা। অবাক হবার মতো, অপরিচিত বাক্য বলে, প্রচণ্ড আহত করে আমাকে। যা ঘটেনি কখনো, যা সত্য নয় তাই বলে। হঠাৎ করেই রেগে যায় সে। তখন হারিয়ে ফেলি আমার প্রেম। ওকে চিনতে না পারলে, ভালোবাসি কী করে? আচ্ছা, ওর সাথে সম্পর্ক যাদের, অন্য সব মানুষদের সাথেও কী এরকম আচরণ করে সে? না কী শুধু আমার সাথেই?

জানতে চাইলে বলবে না। অনেক প্রশ্নের জবাবই দেয় না। দেয় যদি দু-একটি জবাব, তাও কুয়াশা ঢাকা অন্যমনষ্কতায়। আজ যা বলে, দুদিন পরেই পাল্টে দেয় নিজের কথা। তার মানে, নিজের সুবিধা এবং প্রয়োজন মতো কথা বলা। এভাবে কী বোঝা যায় কাউকে? না বুঝলে, খুব কঠিন নয়, সে মানুষকে ভালোবাসা? তবুও, তবুও ভালোবাসি তাকে আমি। খুউব ভালোবাসি। কেন? কোন জবাব কী আছে এর?

‘নাদোর’ এয়ারপোর্টে পেরিয়ে, হোটেলে রুমে আমি। আগে তো এমন হয়নি কখনো। কতো কতো দেশেই তো গেছি কাজের জন্যে। হলিডে উপভোগ করতে গেলেও, সে দেশগুলোর মাটি ও মানুষের সাথে মিশেছি। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিশে, বেরিয়ে, দেশটির সব ধরনের অবস্থা অনুভব করতে চেয়েছি। জানতে চেয়েছি, যা কিছুতে আগ্রহ আমার সঠিক অভিজ্ঞতায়। কতো কতো কতো অভিজ্ঞতা আমার জীবনে।

উৎসাহ পাচ্ছি না কেনো এখন? অচেনা বিষণ্নতা, জোর করে জড়িয়ে রেখেছে আমাকে। আচ্ছা, ও যদি আসতো আমার সাথে এখানে? যদি আমি নিয়ে আসতাম তাকে, একই আচরণ কী করতো আমার সাথে? জানবো কেমন করে?

এই মরোক্কো, অন্য ধরনের একটি দেশ। প্রধান শহরগুলোতে পরিবেশ নির্ভর করে তৈরি করা বাড়িগুলোও অন্য রকম। অনেক আগে যখন এসেছিলাম, এমন ছিল না। ওয়েস্ট্রানাইজড এখন বিভিন্ন ভাবে। ঔপনিবেশের কারণ ছাড়াও, কয়েক ডিকেট ধরে, কেবল টেকনোলজিক্যাল কারণ নয়, ইনফরমেশন ওয়ার্ল্ডের কারণে, পৃথিবীর সব দেশই পাশ্চাত্যের অনেক অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। করে যাচ্ছে। এটাই আধুনিকতা, মনে করছে তারা। মনে করা নয়, গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠিতও করছে। করেছে আগেও। ধর্মপ্রধান দেশগুলোও তার বাইরে থাকছে না। যদিও অনেক জায়গায় ওয়েস্টানাইজড হতে চেয়ে, বিকৃতও করছে অনেক কিছু। সঠিক ভাবে বুঝতে না পারার কারণে।

এরপরও বিপরীত একটি ছবির সাথে পরিচিত আমরা, ‘আলকায়েদা’র উদ্ভবের পর থেকে। ‘আই এস’ ইসলামিক এক্সট্রিমিজমকে ভয়ঙ্কর সব ডায়মেনশন দিয়েছে। তার কিছু প্রভাব রয়েছে এখনও, প্রতিটি দেশে। ড্যামেজ’ড হয়ে যাওয়া মগজের মানুষগুলোর ভেতরে। অদ্ভুত ধরনের কিছু পোশাক পরে বোঝাতে চাচ্ছে, ইসলামিক বিপ্লবের ফ্যান্টাসির বাস্তবতা। এরকমই মনে হচ্ছে আমার। তবে এটাও কমে আসছে কিছুটা, আলকায়েদা আর আইএস এর পরাজিত অবস্থার পর থেকে।

সব দরিদ্র দেশের অথবা সান্ত্বনা হিসেবে বলা, ‘উন্নয়নশীল’দেশগুলোর চেহারা একই। প্রধান শহরগুলোর প্রধান এলাকাগুলোকে করা হয় কসমেটিক সার্জারি। আর তা দিয়ে করা হয় অনবরত উন্নয়ন বিজ্ঞাপন। অসচেতন জনগণকে কনভিন্সড করে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা। এতে কখনো কখনো সফল হয়। সবসময় হয়তো নয়।

প্রধান এলাকাগুলোর ভেতরের ভয়াবহ বৈষম্য, আর অসঙ্গতিগুলো এড়াতে পারে না তবুও, অতি সচেতন মানুষ আর সাংবাদিকদের বিপরীত মানসিকতার চেতনা এবং মগজ। পেরিয়ে প্রধান এলাকাগুলো, ঢুকলে কিছুটা ভেতরে, যে জীবন ছবি দেখা যায়, তা দেখে সুখী হতে পারেন না মানবিক মানুষ। শোষণ, প্রতারণা, বঞ্চনা, ক্ষুধা, নিপিড়ন, কুশিক্ষা এবং এবং এবং। মানুষ, জন্মেছে কী এভাবে বাঁচার জন্যে? কী আমি করতে পারি? পারি অনর্গল জ্বলতে যন্ত্রণায়।

এই অঞ্চলটি ‘নাদোর’ খুব পছন্দ আমার। বেশ কিছু মরোক্কান বন্ধু থাকে এখানে। পারি দেখা করতে কারো সাথে। বিশ্রাম ছাড়া অন্য কাজ নেই, এই শেষ বিকেলে। ফোন করলে, খুব দ্রুত চলে আসবে, সব কাজ রেখে। নিয়ে যাবে আমাকে তাদের কাছে। ফোন, করতে ইচ্ছে করছে না। করবো কী করে? শান্তি কী দিচ্ছে সে আমাকে? এতো এতো এতো অশান্তি তৈরি করছে আমার জীবনে যে, সে কেনো এলো আমার সাথে এখানে? বিষণ্নতা ক্লান্তি অস্থিরতা। স্নান এবং ডিনার শেষে, আর কোন উপায় থাকে না, বিছানার আহ্বান উপেক্ষা করার।

মনের ক্লান্তি হারিয়ে যায় ঘুমের আদরে। জেগে যাই কোন অজানা কারণে আবার। রাত তখন কতো, জানতে ইচ্ছে করে না। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা হয়েছে যতোটুকু, তার জন্যে দায়ী টেলিভিশনের স্ক্রিন। কম ভয়ানক ছিলো না সেটা। কী হচ্ছে আমার? এ কেমন ভূমিকম্প? মাথা থেকে পা। পা থেকে মাথা। ভেঙ্গে যাচ্ছি। ভেঙ্গে যাচ্ছি। হয়ে যাচ্ছি ধ্বংসস্তূপ। বুঝতে পারি, ঢেউ তুলছে ‘অক্সিটোসিন।’ কাঁপাচ্ছে আমাকে। কাঁপাচ্ছে, ভীষণ ভাবে। কোন কর্তৃত্ব নেই আমার এর ওপর। ভূমিকম্প নয় শুধু। একই সাথে টর্নেডো। ঠেকাবো? সে শক্তি কোথায়?

আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি আমি। তোমাকেই ভালোবাসি। আমার অনুভূতির প্রতিটি বিন্দু বলছে। বলছে, প্রবল টর্নেডোর তীব্রতায়। আর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে। সে কোথায়? কোথায় সে এখন? এই ভূমিকম্প, তাকেই চাচ্ছে। তাকেই চাচ্ছে, এই টর্নেডো। আমার ভেতরের যে আমি, তাকে নয়।

ফিরে আসি মরোক্কোর কাজ সেরে। ভূমিকম্প? না শরীরকম্প? অনন্ত অসীম হয়ে কাঁপায় আমাকে। ভালো লাগে না কিছুই। খুউব প্রিয় এই জীবন, আর আমাকে জড়িয়ে থাকা, প্রিয় প্রিয় সবকিছু। যা ছিলো প্রতি মুহূর্তের ভালো লাগা, আর ভালোবাসা। কিছুই আর প্রিয় নয় এখন। সব প্রিয় কী হারাচ্ছি, একটি প্রিয়’র জন্যে? এ অনুভূতিই প্রেম? এই অনুভূতিই সেই ভালোবাসা, যা উন্মাদ করে অস্থিরতায়? কাঁপায় ঘুম ঘুম ক্লান্তিতেও? আর কেউ নেই কেনো, আমার পৃথিবীতে, সে ছাড়া?

দেশে যেতে হলো, জরুরি কিছু কাজে। ওর কাছে পৌঁছানোই কী সবচেয়ে জরুরি ছিলো না? দেখার নেশা। অল্প দেখা মানুষটিকেই, অনেক দেখার নেশা। ‘তোমায় নতুন করে পাবো বলে’ গানটির লিঙ্ক সে পাঠালো আমাকে, আসবো জেনে। শুনলাম। বার বার শুনলাম। রোম্যান্টিসিজমে আক্রান্ত সে? কতোটা? ভাবতে ইচ্ছে করলো, হয়তো সে তেমনই হবে, যেমন হওয়া উচিত আমার সাথে? সেই মানুষটিকেই হয়তো চিনবো এবার, যাকে আমি চাই।

‘ঢাকা এয়ারপোর্টে দেখতে চাই আপনাকে।’ বাক্যটি বললাম হঠাৎ তাকে, অসংযত আবেগে।

প্রেম কী অধির আবেগের, কিছু অধিকার তৈরি করে দেয়? আমার মতো অধিকার সচেতন মানুষকেও? আমি কী এখনও সচেতন? যা কিছু ভাবছি, সচেতন ভাবে? না। আমি কী নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি, অচেনা এই অনুভূতি আমার? না। আমি কী চাচ্ছি নিয়ন্ত্রণ করতে? না। কেনো? চাচ্ছি না কেনো? প্রেম, দিতে চাচ্ছি। পেতেও চাচ্ছি। কারণ, মানুষ বাঁচে প্রেমে। কাজে নয়। তাকে খেতে হয়, সেজন্যে বাধ্য সে কাজ করতে। কাজ তাকে বিরক্ত করে। হতাশ করে। অতিষ্ঠও করে। সে ক্লান্ত হতে থাকে কাজে। প্রতিদিন একই কাজে। প্রেম, ভালোবাসা বাঁচায় তাকে। ব্যালেন্স করে। সময় বাড়িয়ে দেয় জীবনের।

দেখা হলো আমাদের বিমানবন্দরে। নয় মাস পরে। নাহ্ তেমন সে ছিল না। মিললো না আমার প্রত্যাশার সাথে। আমার মানসিক প্রস্তুতির সাথেও। জানালো ওর কাজের ব্যস্ততার কথা। জানালো, বিমানবন্দরে আসার কারণে, কতো কতো কতো ক্ষতি হলো তার। এতো প্রিয় তার কাজ? প্রায়োরিটির দিক থেকে তা প্রথম? অবাক হলেও, স্বাভাবিক থাকতেই পছন্দ করলাম। জেদি আমি তা ঠিক। কিন্তু হট টেম্পারমেন্টের মানুষ নই। রেগে সিদ্ধান্ত নেই না।

অনেক কিছুই সে করলো আমার জন্যে, যা দায়িত্ব মনে করলো। বেশি রাতে বাইরে থাকলে, বাড়িতে পৌঁছে দেয়া। ফোন করে জানতে চাওয়া, কেমন থাকছি প্রতিদিন। দেখা হলে আমাকে খাওয়ানো রেস্টুরেন্টে। সুখময় হলো না তবুও, দেশে থাকা দিনগুলো আমার, ওর সাথে। হলো না প্রেমময়। বাড়তে থাকলো কনফ্লিক্ট। কখনো পৌঁছে গেলো তা, চূড়ান্ত পর্যায়ে। ধারাবাহিক হয়ে উঠলো ওর অভিযোগ, আমার সম্পর্কে। কেনো কাজে ব্যস্ত থাকি এতো? দেরি করে এলাম কেনো? এখন তার আর সময় নেই আমার জন্যে। কার সাথে ব্যস্ত ছিলাম ফোনে। এরকম অনেক ব্যাপারে।

আর অন্তহীন অভিযোগ আমার, ওর অগ্রহণযোগ্য আচরণ সম্পর্কে।

দেশে থাকা দিনগুলো কষ্টময় এমনিতেও। কোন ব্যাবস্থা এবং অবস্থা অনুকূলে নয় আমার। শিশু, অদম্য আগ্রহের বিষয়। যা কিছু পছন্দ করি, ভালোবাসি, তার মধ্যে অন্যতম শিশু। দু-তিন বছরের শিশুদের রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখলে, মানবেতর মানুষদের জীবন দেখলে, অসহ্য হয়ে ওঠে সবকিছু। অসহ্য মনে হয় নিজের বেঁচে থাকা। পেরিয়ে গেছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। অর্ধেক শতাব্দি। যথেষ্ট নয়? না কী যথেষ্টর চেয়েও অনেক অনেক অনেক বেশি। কোন একটি সমস্যা কী বলা যাবে, সঠিক সমাধান হয়েছে যার? অথবা হয়েছে কিছুটাও?

এতো এতো সমস্যার সাথে যুক্ত হলো এবার, নতুন এক সমস্যা। সমস্যাটি, ভালোবাসার মানুষটির আচরণ। যার জন্যে এতো দূর আসা, কী আচরণ সে করছে আমার সাথে? বেদনা বিধ্বস্ত হয়ে নয়, শিল্পিত ভাবে যদি বলি, বলতে হবে, অভিনব অভিজ্ঞতা। অন্য কারো কী হয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা? জানবো কী করে?

অসুস্থ হয়ে ক্লিনিকে যেতে হলো। চেকআপ, চিকিৎসা হলো। কম হলো না ক্লিনিক বিলের পরিমাণ। একজন ডাক্তারও বুঝলেন না, আমার সমস্যা মানসিক। বললাম না আমিও। কথা বললাম না কোন সাইক্রিয়াটিস্টের সাথে, নিজের উদ্যোগে।

যে মানসিক সমস্যা আমার, কে পারবে তার চিকিৎসা করতে? এরকম সমস্যার কথা বলবোই বা কী করে? যে দেশে কাজ করি আমি, সম্ভব হতো সেখানে। দুজনকে একসাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে, মানসিক থেরাপি করতেন সাইক্রিয়াটিস্ট। মেনেও চলতে হতো থেরাপি, চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। প্র্যাকটিস করে, আচরণ বদলে যেতো আমাদের। ভালোবাসা আর ভালোলাগার প্রলেপে, সুস্থ আর সুন্দর হয়ে উঠতে পারতো জীবন।

অনেক অনেক কিছু ঘটলো তবুও, দেশে থাকা সময়ে। পজেটিভ বলা যাবে না, ঘটনাগুলোকে। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত, দ্বিধান্বিত আমি। নাহ্, আর নয়। সরে যেতে হবেই আমাকে, এই সম্পর্ক থেকে। দেখা করি না ওর সাথে, ইচ্ছে করেই কদিন। অক্সিটৌজিন কী ছেড়ে যায় আমাকে? ছেড়ে কী যায় হ্যারিকেন, টর্নেডো, ভূমিকম্প এবং তার প্রতিক্রিয়া?

> নতুন এক অনুভূতি জন্ম নিয়েছে শরীরে, বুঝতে পারি। ভালো লাগে না কোথাও। অফিসে না। বাড়িতে না। বাইরেও না। খেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না, কোন কাজ করতে। পেরিয়ে গেছে ছয় সপ্তাহ। মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে না। ইউরিন টেস্ট করি নিজেই বাড়িতে। পজেটিভ। উল্লসিত হয়ে উঠবো, পারি না। অপেক্ষা করি আরো এক সপ্তাহ। এর মাঝেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, আমার পারসোনাল গায়নোকোলজিস্টের সাথে। অভিনন্দন জানান তিনি, চেকআপের পরে। নিয়ম অনুযায়ী যা যা দেবার, বুঝিয়ে দেন সব প্যাকেট। অপূর্ব এই আনন্দের খবর কী দেবো না তাকে? কী বলবে সে? কিছু সময় নিই, বুঝতে। নাহ, দেবো না। একজন মানুষ আসছে পৃথিবীতে। আমার সন্তান সে

অসহিষ্ণুতা পেরিয়ে যায় তার সবটুকু বর্ডার। উত্তেজিত সে এখন। প্রচণ্ড অসুস্থ আচরণ করে উত্তেজনায়। যা বলতে চায়নি হয়তো, বলে তাও। বলে, উত্তেজনার বেপরোয়া আবেগে। কতোটা অস্বাভাবিক সে? একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এর। নিশ্চয়ই আছে। সেটা জানার আর বোঝার, চেষ্টা করতে হবে আমাকে। বোঝাই নিজেকে আমি। আমি ভালোবাসি তাকে। এতো ভালোবাসি কেনো? না ভালোবাসলে, এতো কষ্ট পায় কেউ?

দেখা করতে হয় আমাকে, ওর সাথে আবার। হেরে যাই নিজের কাছে। অক্সিটোসিনের কাছে। ব্যস্ত হয়ে উঠি বাড়ি ফিরতে, মধ্যরাতে।

‘আজ এখানেই থাকবো আমরা, ফিরতে হবে না।’ বললো সে।

কী যে হলো আমার। কী হলো ওর? কী হলো আমাদের? কী দিলো এবং দিলো না সেই আলো ঝলমল রাত, সে হিসাব করবো না। এসেছিলো। এনেছিলো, টক ঝাল মিষ্টি মেশানো অন্য সময়। মধ্য থেকে শেষ রাত। সকাল থেকে দুপুর। দুপুর থেকে সন্ধ্যে। আবার, এবং আবার। বিলীন হয়েছিলাম আমরা প্রবল প্রেমে।

বলেছিলো সে আমাকে।

বলেছিলো বার বার, ‘ভালোবাসি তোমাকে আমি। অনেক অনেক ভালোবাসি। যদি কোন ঈশ্বর থাকতো বুকে, সে হতে তুমি।’

কেঁপে উঠেছিলো কী তখন, গভীরতম আবেগে? হয়তো। সে কেঁদেছিলো কেনো, তা না হলে?

ফিরে আসার আগে, দেখতে চাইলো আমাকে, আর একবার। এবার কণ্ঠে তার বিনীত আহ্বান। সময় ছিলো না, একেবারেই। উপেক্ষা করবো ওকে, কেমন করে? এতো প্রেমময় সে। এতো? কয়েক ঘণ্টা পরেই ফ্লাইট আমার। এয়ারপোর্টে যাবার আগে, হিসাব করতে হবে যানজটের। বিরক্ত

হলো না, আমার ব্যস্ততায়।

‘দেখা করে যেতেই হবে তোমাকে আজ, কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও।’ অনুরোধ, অনুনয় একটিই।

বললো, বার বার বললো, ‘অনেক ভালোবাসি তোমাকে আমি, অনেক। তুমি চলে যাবে আজ? কী করে কাটবে দিন আর রাত? এতো শূন্যতা কী সহ্য হবে আমার?’

আরও কিছু বেদনাহত বাক্য, বললো সে। জল ঝরেছিলো সেদিনও দু’চোখে তার। বিষণ্ন হয়েছিলো কণ্ঠ, দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকা বিচ্ছেদের বেদনায়। পরিয়ে দিয়েছিলো আমার গলায়, একটি মালা। জড়িয়ে রেখেছিলো বুকে, পেরেছিলো যতোক্ষণ। ভরিয়ে দিয়েছিলো, কোমল চুমোয়।

উত্তেজনা, দিশেহারা মেজাজ, রাগ, রাগ আর রাগ। যা ইচ্ছে বলা। কিছুই আক্রান্ত করেনি তাকে, সেই ব্যথিত সন্ধ্যায়। ভীষণ ত্যাদড় এই যুবকটিকে। কেনো? জানি এর জবাব। আজ আর এতো কথা বলবো না।’ উঠে গেলো বর্ণালী।

বিকেল থেকে সন্ধ্যে, চারবার বাথরুমে গেলো সে।

‘বায়োলজিক্যাল কোন ডিজঅর্ডার নয়তো?’ জানতে চাইলাম, ফিরে এলে।

‘ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে ভেতরে।’ বললো।

‘মেডিক্যাল হেলপ লাগবে?’ প্রশ্ন করলাম।

নিতে চাইলো না। আজ আমার বাড়িতেই থাকবে। প্ল্যান ছিলো আমাদের। ডিনারের প্রস্তুতিও ছিলো।

তরুণী হয়েছে এরই মাঝে, ওক গাছের ওপরে থাকা ক্লান্ত চাঁদ। পাতার আড়াল থেকে পালিয়ে আসা চাঁদের আলো, যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা বলা যাবে একটি শব্দে, অপরূপ। বারান্দাতে বসলাম এবার আমরা, ডিনারের পরে।

আজ আমাদের গল্প শোনার দিন এবং রাত। গল্প নয়। বর্ণর জীবনে গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা ঘটনাপ্রবাহ। শোনার আগ্রহ ছিলো আমার। তা-ই ওর বলা।

‘অনরবত ফোন আলাপের প্রেমময় মুগ্ধতায়, টেক আপ করলো দেশ ছাড়ার ফ্লাইটটি। টক ঝাল মিষ্টি প্রেমের স্মৃতি, আর মুগ্ধ শূন্যতায় পেরিয়ে এলাম, দশ হাজার মাইলের দূরত্ব। সান্নিধ্য অধীরতা, আবার দেখতে পাওয়ার নেশা বিভোরতায় কাটলো আমাদের কটি দিন। স্মার্ট ফোন দায়িত্ব নিলো, ‘সাত সাগর আর তেরো নদীর’ দুই পাড়ের দুটি প্রেম ব্যাকুল হৃদয়ের মধ্যে ব্যালেন্স করার।

সে কী বদলে গেছে? সত্যিই? বদলেছে কী, প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করে? বদলেছে কী, আমাকে তার প্রয়োজন, তাই? এই বদলানো পজেটিভ। খুউব ভালো লাগছে আমার। হ্যাঁ, ভালোবাসি আমরা। ভীষণ ভালোবাসি। দুজনে, দুজনকে।

দুটি সপ্তাহ মাত্র। ফিরে গেলো সে তার আগের চরিত্রে, আবার। চমকে উঠলাম। শুরু হলো যুদ্ধ। নিজের আবেগের বিরুদ্ধে নিজের। নিজের অনুভূতির বিরুদ্ধে নিজের। অভিনব এই যুদ্ধ, ক্লান্ত করে তুললো আমাকে। সিদ্ধান্ত নিতেই হবে এবার। যতো রক্তক্ষরণ হোক হৃদয়ে। পারছি না আর। কীসের প্রেম এটা? কি রকম আবেগ? উগ্র মেজাজ, আর উত্তেজিত আচরণ, ভালোবাসা হয় কীভাবে?

নাহ্ আর নয়। বন্ধ করে দিলাম যোগাযোগ। কঠিন সময়। তার জন্যে। আমার জন্যে। খুঁজছে আমাকে। খুঁজছে ব্যাকুল হয়ে। অস্থিরতায় উদভ্রান্ত সে। অনুভব করি। স্থির থাকতে হবে সিদ্ধান্তে। খুন করতে হবে, অবাধ্য এই প্রেম অনুভূতি। আর নয়। পেরিয়েছে আরো চার সপ্তাহ।

নতুন এক অনুভূতি জন্ম নিয়েছে শরীরে, বুঝতে পারি। ভালো লাগে না কোথাও। অফিসে না। বাড়িতে না। বাইরেও না। খেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না, কোন কাজ করতে। পেরিয়ে গেছে ছয় সপ্তাহ। মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে না। ইউরিন টেস্ট করি নিজেই বাড়িতে। পজেটিভ। উল্লসিত হয়ে উঠবো, পারি না। অপেক্ষা করি আরো এক সপ্তাহ। এর মাঝেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, আমার পারসোনাল গায়নোকোলজিস্টের সাথে।

অভিনন্দন জানান তিনি, চেকআপের পরে। নিয়ম অনুযায়ী যা যা দেবার, বুঝিয়ে দেন সব প্যাকেট।

অপূর্ব এই আনন্দের খবর কী দেবো না তাকে? কী বলবে সে? কিছু সময় নিই, বুঝতে। নাহ, দেবো না। একজন মানুষ আসছে পৃথিবীতে। আমার সন্তান সে। সবটুকু অনুভূতি দিয়ে ‘ওয়েলকাম’ করছি তাকে। যা কিছু করা দরকার, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি করবো। ভ্রূণ থেকে তৈরি হচ্ছে ছোট্ট বাবুনি। এরচেয়ে বেশি আনন্দ কী হতে পারে এই সময়ে?

কিন্তু এমন হচ্ছে কেনো? সে তো আসছে দুজনের জন্যে। দুজনের হয়ে। কেনো আমি বলতে পারছি না, আমাদের সন্তান। শুধু আমার পরিচয়ে বড়ো হলে সে কী সুখী হবে পুরোপুরি? তাকে তো জানতেই হবে, কে তার বাবা। জানলেই কী হবে? বাবার সাথে নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজন কী থাকবে না তাঁর। আমি কী বঞ্চিত করবো তাকে, বাবার অধিকার থেকে? বুঝতে পারছি না। কী করবো?

জানাই যদি, কী প্রতিক্রিয়া হবে তার? সে কী প্রস্তুত বাবা হবার জন্যে? অস্বীকার করে যদি? উহ্, কী কঠিন সময়। অপূর্ব এই আনন্দ কেনো, এতো বেদনার মনে হচ্ছে আমার? কী করবো আমি?

পেরিয়েছে আরো কটি সপ্তাহ। জটিল এই সংকট রূপান্তরিত হচ্ছে, ভয়াবহ জটিলতায়। বেড়ে উঠছে সোনামণি বাবুটি, ভেতরে আমার। শিশু, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। সবচেয়ে প্রিয় মানুষও। এতো এতো এতো প্রিয় যে, তাকে কেনো ফেলছি আমি, এমন অপ্রিয় সংকটে? আসতে পারছি না কোন সিদ্ধান্তে। শতভাগ মনোযোগী হয়ে উঠি আমার বাবুর প্রতি। আমার শরীরের প্রতি। ভুলে যেতে চাই আর সবকিছু। চাইলেই কী হয়? সমাধান না করলে, নিজে থেকে তো শেষ হবে না সমস্যা।

সমাধান আছে প্রতিটি সমস্যার। সমস্যা আসে আগে। আর সমাধান আসে পরে। সমাধানে না পৌঁছতে পারার সময়টুকুই আসলে সমস্যা।

ফোন এলো তার একদিন, আবার। সম্ভব হলো না এবার এড়িয়ে যাওয়া। অভিযোগে বিক্ষত করলো আমাকে। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত সে। বললাম তাকে।

‘কোন দায় অথবা দায়িত্ব নিতে হবে না তোমাকে। ও আমার সন্তান। বলতে চাইনি। তবুও বললাম।’

কোন জবাব এলো না তার কাছ থেকে, কিছুক্ষণ। কিছু বললাম না আমিও আর। ডিসকানেক্ট করলাম ফোন লাইন।

ফোন এলো আবার, পরদিন।

বললো সে এবার, ‘সত্যি বলছো তুমি? একটি বাবু আসছে আমার?’

‘তোমারও নয়। আমারও নয়। বাবুটি আমাদের। তা তুমি চাইলেও। না চাইলেও।’ বললাম।

‘মানে? এরচেয়ে বেশি সুখ আর কী আছে আমার? একটি জীবন অপেক্ষা করেছি, একটি অথবা দুটি বাবুর জন্যে। আর সে বাবু তৈরি হচ্ছে, তোমার শরীরে, কতোটা আনন্দের আর গর্বের ব্যাপার, তা কী বোঝানো যাবে, বলো?’ বললো সে।

কথা হলো সেদিন অনেকক্ষণ, অনেক দিন পর। কথা হলো বাবুনিকে নিয়েই। স্বপ্ন আর আনন্দ মিলে, ভীষণ সুখী হয়ে উঠলাম আমরা। তবুও তুললাম সেই কথা। ওর মেজাজ আর আচরণের কথা। বাবা হবার জন্যে, বাবার চরিত্রও তো গড়তে হবে।

‘বুঝতে পারছি, অনুভবও করছি, এরকম আচরণ করে কারোই হতে পারবো না আমি। না তোমার। না বাবুর। শাস্তিতো কম হয় নি কিছু। তোমাদের দুজনকে ছাড়া চলবে না আমার। তিনটি মাস সময় দাও। দেখো, ঠিক ঠিক বদলে যাবো আমি। তোমাদের ছাড়া কী ভাবে বেঁচে থাকবো? সম্ভব বলো?’ বললো সে।

অনুভব করলাম তার উপলব্ধি। মনে হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে তার ভুল। নিশ্চয়ই বদলাবে এবার। তোর কী মনে হয় বলতো?’ থামলো বর্ণালী।

আবার বাথরুমে গেলো সে। কী বলবো ওকে আমি? সত্য বলবো? মিথ্যে বলবো?

ওকে কিছু বলার আগে ভাবলাম। যা ভাবলাম, তা এরকম।

‘মানুষ বদলায় না। তার জীবনের প্রয়োজনে, পরিস্থিতি বাধ্য করলে, বদলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে, তার চরিত্রেই ফিরে যায় সে। কারণ, নিজের অভ্যাসে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে মানুষ।

জন্মগত ভাবে পাওয়া, এবং পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের গড়ে তোলা চরিত্রই তার নিয়ন্ত্রক আসলে। ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই। তবে ব্যতিক্রম কিছু ঘটনা দিয়ে তো আর ইনজেনারেল অবস্থাকে বিচার করা যায় না।’

বুঝতে পারছি না কী বলবো আমি বর্ণালীকে। অ্যাবসলিউট কথা কী বলা যায়? না, বলা উচিত?